চন্দ্রযান ও চিপঃ স্পেস থেকে পাওয়া শিক্ষার প্রয়োগ সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে?

প্রণয় কোটাস্থানে ও অভিরাম মাঞ্চি

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

প্রযুক্তিকেন্দ্রিক নীতির প্রেক্ষিতে দেখলে, ২০২৩ সালের চন্দ্রযান-৩ মিশন – যার পরে চাঁদে রোভার নামানর ক্ষেত্রে ভারত চতুর্থ, ও চাঁদের উত্তর মেরুর কাছাকাছি এই রোভার অবতরণ করানর ক্ষেত্রে প্রথম দেশ – তাকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে। যদি, মূলত সরকারচালিত প্রচেষ্টার ফলে ভারত একটি বাস্তব স্পেস শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তাহলে কি সেই প্রচেষ্টা থেকে আহৃত শিক্ষার সাহায্যে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রেও কি ভারত একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হয়ে উঠতে পারে?

বহু দশক ধরে বিশ্বায়নের প্রিয়তম সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকার পরে, গত কয়েক বছরে সেমিকন্ডাকটর নির্মাণকারী সেক্টরটি শিল্পনীতিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টার মনোযোগের কেন্দ্রে চলে এসেছে। এর কারণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি, অধিকাংশ উন্নততর চিপের জন্য আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল তাইওয়ানের উপর একটা ধরনের অনুমিত অতিরিক্ত নির্ভরতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্থানীয়ভাবে চিপ নির্মাণ শিল্প তৈরি করার জন্য অনেক দেশের সরকারই অসংখ্য আর্থিক অনুদান ও নীতির দিক থেকে অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। চিপ উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠার আশায় ভারতও সেমিকোন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অধীনে দশ বিলিয়ন আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেছে। যদিও চিপ নকশা করার পরিষেবার এলাকায় ভারতের একটি প্রবল উপস্থিতি আছে, কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে চিপ উৎপাদনের কোনও কেন্দ্র ভারতের নেই। সেমিকোন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম আশা করে যে, তারা এই সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিটি অংশে ভারতের উপস্থিতি প্রবলতর করে তুলতে পারবে।

স্পেস প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে তেমনই, এই প্রচেষ্টাগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতা গভীরভাবে নির্ভর করে শুধুমাত্র বিনিয়োগ নয়, বরং সরকার কি ধরনের নীতি নির্মাণ করছেন, তার উপরেও। এবং আবারও স্পেস প্রোগ্রামটির মতই, একটি দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর শিল্প নির্মাণের লক্ষ্য সত্যিই সাধিত হলে, ভারত এমন একটি ক্ষুদ্র ও অভিজাত দলের সদস্য হয়ে উঠবে, যারা চিপ নির্মাণে সাফল্যের মুখ দেখেছে। এমনকি, এই সাফল্য অর্জন করার জন্য যে প্রচেষ্টাগুলি কাজে লাগান হচ্ছে তাকে অনেক সময়ই "মুনশট" বলে ডাকা হয়। এই নামটি থেকে চন্দ্রযানের সঙ্গে এর তুলনাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই, এই প্রচেষ্টাগুলি কি সত্যিই তার অত্যন্ত সফল স্পেস প্রোগ্রাম থেকে ভারত যে পাঠগুলি পেয়েছে, তার প্রতিফলন?

এই প্রশ্নটি আমাদের *হোয়েন চিপস আর ডাউনঃ এ ডিপ ডাইভ ইনটু এ গ্লোবাল ক্রাইসিস* (ব্লুমসবেরি, ২০২৩) নামের বইটির চালিকাশক্তিগুলির মধ্যে একটি। একটি দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর শিল্প নির্মাণের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রয়াসকে আমরা এই বইতে নিরীক্ষণ করে দেখেছি। স্পেস ও পারমাণবিক দিকদুটিকে প্রামাণিক উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়ে, পুরনো প্রযুক্তি এবং এআই গবেষণা ও উন্নততর সেমকন্ডাক্টরের মত নতুন যুগের প্রযুক্তির মধ্যে আমরা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, একটি কার্যক্ষেত্র থেকে আরেকটিতে নীতির স্থানান্তর কাম্য নয় এবং তা ফলপ্রসূও নয়।

তিনটি বিশেষত্বের কারণে স্পেস ও পারমাণবিক প্রযুক্তির এবং সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, স্পেস ও পারমাণবিক প্রোগ্রাম থেকে যে ফলাফল দাবি করা হয় তা পরিমাণে অনেক কম। এই প্রোগ্রামগুলির সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলি কেবলমাত্র একজন ক্রেতার জন্যই পণ্যের উৎপাদন করে – এবং এই ক্রেতা হল সার্বভৌম সরকার। এর সঙ্গে একটি সেমিকন্ডাক্টর নির্মাণকারীর তুলনা করলে বোঝা যাবে যে, এই ধরনের সংগঠন একটিমাত্র ক্ষুদ্রাকৃতির সরকারি ফরমায়েসের উপর নির্ভর করে টিঁকে থাকতে পারে না। একটি চিপ নির্মাণকারী সংস্থার কাজের জন্য সুবিশাল অগ্রিম মূলধনের প্রয়োজন হয়। তাই, নির্মাতারা যদি কোনও রকমের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জনের আশা করেন তাহলে সরকারি কাজের পাশাপাশি, যে সব সংস্থা বিরাট সংখ্যায় চিপের নকশা তৈরি করে, তাদের হাতেও কাজের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু স্পেস ও পারমানবিক ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় ফলাফল অনেকটাই কম, তাই এর জন্য যতটা ব্যয় হয়, তার বিনিয়োগ সরকারের পক্ষে থেকে সম্ভব। যেমন, তিনটি চন্দ্রযান মিশনের মোট বাজেট ছিল ১৯৭৭ কোটি টাকা। এর বিপরীতে, মাইক্রোন টেকনোলজি নামের আমেরিকান সংস্থাটি গুজরাটে যে চিপ প্যাকেজিং কারখানাটি স্থাপন করতে চলেছে, সেই একটি কারখানারই অনুমিত ব্যয় প্রায় ষোল হাজার কোটি টাকা।

তৃতীয়ত, স্পেস ও পারমাণবিক ক্ষেত্রের সরবরাহ শৃঙ্খল আয়তনে অনেক ছোট এবং উল্লেখযোগ্যভাবে স্বদেশীকরণ করা সম্ভব। প্রথমদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রযুক্তি নিয়ে আসা হত এবং এর থেকে ভারতের স্পেস প্রোগ্রাম অনেক উপকৃত হয়েছে। তার পর, প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকদের একটি ছোট গোষ্ঠী স্বদেশীকরণ ও প্রযুক্তির উন্নতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। একই ভাবে চিনের থেকে আনা প্রযুক্তির সাহায্যে পাকিস্তান তার নিজস্ব পারমাণবিক প্রোগ্রাম আরম্ভ করে এবং ওই দেশের বৈজ্ঞানিকরা তাদের ইনকামিং প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করতে শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তি আমদানি করার পর, অবিচলিত সরকারি অনুদানের সাহায্যে এই ধরনের সরকারচালিত প্রোগ্রামগুলি সাফল্য পেতে থাকে। সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খল, যা একটি তুলনামূলকভাবে সুবিধা-নির্ভর বিশেষীকরণের পথ অবলম্বন করে, তার জন্য এই জাতীয় পন্থা উপযুক্ত নয়। ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে অবস্থিত সংগঠন, সরবরাহ শৃঙ্খলের বিশেষ বিশেষ অংশের উপর মনোযোগ দেয়। দি ইউএস সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন অনুমান করে যে, অন্তত ছয়টি প্রধান অঞ্চলের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চিন, তাইওয়ান ও ইউরোপ) প্রত্যেকটি থেকে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের মোট মূল্যের আট শতাংশ বা তার বেশি আসে। হোমি ভাবা ও বিক্রম সারাভাই-এর মত সেমিকন্ডাক্টরের বিষয়ে ধী ও কল্পনাশক্তি সম্পন্ন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক, ভারতের পারমাণবিক ও স্পেস

প্রোগ্রামের সাফল্যের জন্য যাঁদের অনেক সময়ই কৃতিত্ব দেওয়া হয়, তাঁরাও বিদেশি সংগঠনের থেকে আসা মধ্যবর্তী যোগান, দক্ষতা ও মূলধনের মত বিষয়কে পরিহার করবেন না।

যে সমস্ত দেশে সরকারচালিত স্পেস ও পারমাণবিক প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবল সাফল্য দেখা গেছে, সেগুলি যে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে তা অর্জন করতে পারে নি – এই ঘটনা থেকেই আমাদের এই যুক্তির সপক্ষে আমরা কিছু অভিজ্ঞতাপ্রসূত উদাহরণ পেয়ে যাই। চিনের উদাহরণটিকে বিবেচনা করে দেখা যাক। মাও সে তুং *জিলি গেংসেং* – "নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুনর্জন্ম" – এই জিগিরকে জনপ্রিয় করেন। ১৯৫৬ সালে, দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রয়াসের একটি চিত্র প্রকাশ করার জন্য, তার নির্দেশিকা হিসেবে চিন একটি বার বছর ব্যাপী পরিকল্পনার ঘোষণা করে। এই পরিকল্পনার অধীনে যে বারটি প্রযুক্তিকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সেমিকন্ডাক্টর তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিকন্ডাক্টরের বিষয়ে পঠনপাঠন চালু হয় এবং সরকারচালিত কারখানা ও গবেষণাগারে এই সেক্টর নিয়ে কাজ করাও শুরু হয়ে যায়। ১৯৬৫ সাল নাগাদ, তাইওয়ান ও জাপানেরও আগে, চিন তার প্রথম চিপ উৎপাদন করে। কিন্তু কিছুটা প্রাথমিক সাফল্যের পর, এই মূলত সরকারি প্রয়াস অন্যান্য দেশের থেকে পিছিয়ে পড়ে। বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতা যে ধরনের শৃঙ্খলা আনে, তার অনুপস্থিতিতে এই সংগঠনগুলি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। নিত্য উন্নতিকরণ ও মূলধনের সঞ্চারণের দাবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এই সংস্থাগুলি অক্ষম ছিল। স্নায়ুযুদ্ধ যখন তার শীর্ষে, সেই সময় আমেরিকার সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ঘটনাটিও প্রযুক্তিগত উন্নতিকরণের গতি মন্থর করার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

যাই হোক, সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তিতে চিন যতটা অগ্রগতি অর্জন করেছিল, তা সম্পূর্ণ থেমে যায় কালচারাল রেভলিউশনের সময়। ১৯৮০-র দশকে এই শিল্পকে পুনরায় সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ততদিনে চিনের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। অধিকাংশ সংস্থাই তাদের উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণ করতে পারে নি এবং তাদের ব্যবহৃত প্রযুক্তিও ততদিনে পুরনো হয়ে গেছে। অবশেষে, ১৯৯০-এর দশকে চিনের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ঢুকতে শুরু করলে আবার সবকিছু ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাটিও অনেকটা এক রকম। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্পেস প্রোগ্রামের জন্য যেমন স্টার সিটি, এই দেশের আশা ছিল যে, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ক্ষেত্রেও জেলেনোগ্রাদ নামের নতুন শহরটি তেমনই বিজ্ঞানের স্বর্গ হয়ে উঠবে এবং সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে শ্রেষ্ঠতার শিখরে উঠবে। এমনকি, সোভিয়েত "সিলিকন ভ্যালি" হয়ে ওঠার কথা ছিল এই শহরের। সোভিয়েত ইউনিয়ন এক্ষেত্রে একটি "নকল কর" আদর্শের অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে চোরাই করে চিপ এনে, স্থানীয়ভাবে সেগুলিকে বিপরীতমুখী প্রকৌশল বা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার ও উৎপাদন করার চেষ্টা করা হত। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে সেমিকন্ডাক্টরকেন্দ্রিক ইকোসিস্টেম থেকে বাদ পড়ার পর এই সংগঠনগুলি, আন্তর্জাতিক বাজারকে তাড়া করার বদলে, সোভিয়েত সামরিক বাহিনীকে চিপ সরবরাহ করায় মন দেয়। অচিরাৎ তাদের এই সবকটি প্রকল্পই পিছিয়ে পড়ে। আজও রাশিয়াতে একটিও বাণিজ্যিকভাবে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদক নেই।

ভারতের ব্যাপারটিও খুব আলাদা নয়। দুটি ভারতীয় বেসরকারি সংস্থা, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড (বিইএল) এবং সেমিকন্ডাক্টর কমপ্লেক্স এলটিডি (এসসিএল) পাশ্চাত্যের চিপ নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই দুই সংস্থাই প্রাথমিকভাবে সফল হলেও, ১৯৮০-র দশক নাগাদ তারা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন ও ভারতের এই জাতীয় প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতা থেকে, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে সাফল্য আনার জন্য ঠিক কি ধরনের সরকারি নীতির প্রয়োজন তা বোঝা যায়। প্রথমত, ক্রমাগত মূলধন সঞ্চারণ এবং প্রযুক্তির উন্নতিকরণ দাবি করে এমন তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কোনও উৎসাহ সরকারচালিত চিপ সংস্থাগুলির ছিল না। এই সংস্থাগুলি শুরু করেছিল চমৎকারভাবে, কিন্তু খুব বেশি দিন তারা প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে পারে নি। এমনকি, সরকারের মধ্যেই তাদের যে ক্রেতা ছিল, তাঁরাও মুখ ঘুরিয়ে নেন ও বাইরে থেকে আরও ভাল প্রযুক্তি অনেক কম খরচে আমদানি করতে শুরু করেন।

দ্বিতীয়ত, এই সংস্থাগুলি আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার হাত থেকেও বাঁচিয়ে রাখা হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, খানিকটা প্রতিযোগিতার আবহাওয়া থাকলে তবেই উৎপাদক সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পণ্যকে অন্য সংস্থার পণ্য থেকে বিশিষ্ট করে তোলার চেষ্টা করে। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতিতে এই সংস্থাগুলি সরকারি বিভাগের বাইরে কোনও নতুন ক্রেতা খোঁজার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বিইএল ও এসসিএল, এই দুই সংস্থাই চিপ উৎপাদনের প্রতিযোগিতার অংশ ছিল। কিন্তু সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রতিযোগিতা অপ্রয়োজনীয়, কারণ একই কাজ করছে এমন দুটি সংস্থার উপস্থিতি আসলে সম্পদের অপচয়। তাই এসসিএল-কে বেছে নেওয়া হয় চিপ উৎপাদনের জন্য, এবং বিইএলকে চিপের বিভিন্ন অংশ জোড়ার কাজে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অন্যদিকে, তাইওয়ানে সরকার পরিচালিত ইআরএসও অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা আহ্বান করে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আবহাওয়া লালন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিযোগিতার বিষয়ে ভারতের এই বিশেষ অবস্থান সরকারের টাকা বাঁচাতে পারে, কিন্তু তাতে কোনও রকম উদ্ভাবনের পরিপন্থী একটি কাঠামো স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, অন্তর্মুখী বাণিজ্য ও ব্যবসা নীতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রধান অর্থনৈতিক আখ্যানটি ছিল বৈদেশিক মুদ্রা ও ডলারকে দেশের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচান। এর অর্থ, আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চহারের শুল্ক। এমনকি এই মাশুলগুলি দেওয়ার পরেও, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় বন্দরে আটকে থাকতে পারে। এই সব কিছু একসঙ্গে মিললে এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছিল, যার ফলে বিইএল ও এসসিএল-এর উৎপাদিত দ্রব্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় টিঁকতে পারে নি। স্বনির্ভরতার সন্ধানে মগ্ন সরকার, চিপ রপ্তানিতে শুধু অনাগ্রহীই নয়, দ্বিধাগ্রস্তও ছিলেন।

এই অভিজ্ঞতাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, স্পেসের ক্ষেত্রে যে নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়েছে, সেই একই কৌশল সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। তৎসত্ত্বেও, ভারত স্পেস এবং পারমানবিক ক্ষেত্রে যে তুমুল সাফল্য পেয়েছে, তা সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে একটি সুবিশাল

মানসিক প্রেরণা যোগায়। এই সাফল্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সঠিক নীতিগত উপাদান থাকলে, ভারত এই প্রযুক্তিগত উল্লম্ফনকে আবারও সম্ভব করতে পারবে।

প্রণয় কোটাস্থানে তক্ষশিলা ইনস্টিটিউশানের সহকারী পরিচালক ও তিনি হাই-টেক জিওপলিটিক্স প্রোগ্রামের চেয়ার করেন।

অভিরাম মাঞ্চি বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ এবং ডিজিটাল টেকনোলজিতে এমএস করছেন।